৮

মুজিবনগর সরকার

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বাংলার শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের স্মরণীয় সাফল্য ও কৃতিত্ব। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তাঁরই নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ হয় মুজিবনগর এবং অস্থায়ী সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর মুজিবনগরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে এর সদর দপ্তর কলকাতা স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতাকামী দেশে দেশে এ ধরনের সরকার গঠনের নজির অসংখ্য। পোলান্ডের স্বাধীনতাকামী প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল লন্ডনে। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন কম্বোডিয়ান সরকারের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল বেইজিংয়ে। কোন কোন সময় এরা থাইল্যান্ডেও অবস্থান করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত আফগান সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত আফগানিস্তানের মোজাহেদীনদের সদর দপ্তর ছিল পাকিস্ড়ানের পেশোয়ারে, প্রবাসী পিএলও সরকারের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় প্রথমে বৈরুতে, পরবর্তীকালে আম্মানে এবং সর্বশেষে তিউনিশিয়ায়। তবে এসব সরকারসমূহের তুলনায় মুজিবনগর সরকার ছিল অনেকটাই অতুলনীয়। কারণ স্বাধীন অঞ্চলে নেতৃত্ব, দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনসমর্থন ও সহানুভূতি, নিজস্ব আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা এবং সর্বোপরি দেশের অভ্যন্ড়রে আপামর জনগণের নজিরবিহীন সমর্থন ও ত্যাগ স্বীকার, পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা এবং অসম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদি দিক বিবেচনায় মুজিবনগর সরকার ছিল সত্যিই অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, প্রায় এক কোটির মত শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি গেরিলা বাহিনীর মাধ্যমে পাকবাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা ইত্যাদি সবকিছুই ছিল মুজিবনগর সরকারের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. মুজিবনগর সরকার গঠন
- পাঠ-২. অভ্যন্তরীণ প্রশাসন
- পাঠ-৩. বহির্বিশ্বে তৎপরতা

পাঠ-১

মুজিবনগর সরকার গঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয় তা জানতে পারবেন;*
- *মুজিবনগর সরকার কখন শপথ গ্রহণ করে সে সম্পর্কে অবহিত হবেন;*
- *মুজিবনগর সরকারের গঠন কাঠামো কেমন ছিল তা বলতে পারবেন;*
- *মুজিবনগর সরকারে কারা কি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে জানবেন।*

মুজিবনগর সরকার গঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দেশী-বিদেশী ১২৭ জন সাংবাদিক ও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল। এ শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এ সরকারের সদর দপ্তর প্রথম স্থাপিত হয় মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা)। পরবর্তীকালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানের সুবিধার্থে এ সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তর হয়। কারণ মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের মাত্র ২ ঘন্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমা বর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ৭ জন। এসময় মুজিবনগর সরকারের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রপতি	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান সামরিক শাসকদের হাতে বন্দি)।
উপ-রাষ্ট্রপতি	:	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
প্রধানমন্ত্রী	:	তাজউদ্দীন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী	:	এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	:	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী	:	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
প্রধান সেনাপতি	:	কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানী, এম.এন.এ.
চিফ অব স্টাফ	:	কর্নেল (অব.) আবদুর রব

ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং
বিমান বাহিনী প্রধান : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার

বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত জনপ্রতিনিধিবৃন্দঃ

সাহায্য ও পুনর্বাসন	:	অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম.এন.এ.
তথ্য, বেতার ও প্রচার	:	আবদুল মান্নান, এম.এন.এ.
ভলান্টিয়ার কোর	:	আমিরুল ইসলাম, এম.এন.এ.
বাণিজ্য বিষয়ক বিষয়াদি	:	মতিউর রহমান, এম.এন.এ.

অস্থায়ী সচিবালয়ের সরকারি কর্মচারীবৃন্দঃ

সেক্রেটারি জেনারেল	:	রুহুল কুদ্দুস
ক্যাবিনেট সচিব	:	হোসেন তাওফিক ইমাম
অর্থ সচিব	:	খন্দকার আসাদুজ্জামান
প্রতিরক্ষা সচিব	:	আবদুস সামাদ
পররাষ্ট্র সচিব	:	মাহবুবুল আলম চাষী (নভেম্বর ১৯৭১, পদচ্যুত)
তথ্য ও বেতার সচিব	:	আনোয়ারুল হক খান
সংস্থাপন সচিব	:	নুরুল কাদের খান
কৃষি সচিব	:	নুরুদ্দীন আহমদ
স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান	:	আবদুল খালেক
বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত	:	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
নয়াদিলি- তে মিশন প্রধান	:	হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
কলিকাতার মিশন প্রধান	:	হোসেন আলী
পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান	:	ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ	:	ড. মোশাররফ হোসেন
	:	ড. খান সরওয়ার মুর্শেদ
	:	ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস
	:	ড. আনিসুজ্জামান
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান	:	ড. এ. আর. মল্লিক
ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালক	:	উইং কমান্ডার এস. আর. মির্জা
পরিচালক,তথ্য ও প্রচার দপ্তর	:	এম. আর. আখতার মুকুল
পরিচালক, বেতার কেন্দ্র	:	শূন্য
পরিচালক, চলচ্চিত্র বিভাগ	:	আবদুল জব্বার খান
পরিচালক, স্বাস্থ্য দপ্তর	:	ডাক্তার টি. হোসেন
সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য দপ্তর	:	ডাক্তার আহমেদ আলী
ত্রাণ কমিশনার	:	শ্রী জে.জি. ভৌমিক

উপ-সচিব, দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়	:	আকবর আলী খান
উপ-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	:	ওয়ালীউল ইসলাম
উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	খোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
ট্রান্সপোর্ট, অফিসার	:	এম.এইচ. সিদ্দিকী
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব	:	কাজী লৎফুল হক
প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব	:	ড. ফারুক আজিজ হক
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	:	মামুনুর রশিদ
অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব	:	সা'দত হোসাইন
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	:	কামাল সিদ্দিকী
প্রধানমন্ত্রীর স্টাফ অফিসার	:	মেজর নূরুল ইসলাম (শিশু)
প্রধানমন্ত্রীর পি.আর.ও.	:	আলী তারেক
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পি.আর.ও.	:	রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পি.আর.ও.	:	কুমার শংকর হাজরা
প্রধান সেনাপতির দু'জন এডিসি	:	ক্যাপ্টেন নূর ও শেখ কামাল
প্রধান সেনাপতির পি.আর.ও.	:	মোস্তাফা আল্লামা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার	:	জাওয়াদুল করিম ও আমিনুল হক বাদশা

১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংগঠন ও কার্যাবলীর ওপর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল:

১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩. অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪. মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়
৫. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
৬. স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ
৭. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১০. সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১১. কৃষি বিভাগ
১২. প্রকৌশল বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থা ছিল যারা সরাসরি মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীন কাজ করতেন, যেমন-

১. পরিকল্পনা কমিশন

২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড

৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির

৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি এবং

৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড।

সারসংক্ষেপ

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলেও শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। প্রথমে মোট ৭টি মন্ত্রণালয় নিয়ে সরকার গঠিত হয়। তবে মোট ৪ জন মন্ত্রী এই ৭টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠিত হলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও পদাধিকার বলে সশস্ত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় এম.এন.এ. কর্নেল (অব) ওসমানী। বহির্বিশ্বে সরকারের বিশেষ দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। অক্টোবর মাসে মুজিবনগর সরকার সম্প্রসারিত হয় এবং ২০ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ সচিবের এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২। এম. আর. আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি।*

৩। এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৫।

৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র*, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয়-

(ক) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল (খ) ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল

(গ) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ (ঘ) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

২। মুজিবনগর সরকার কবে শপথ গ্রহণ করে-

(ক) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ (খ) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল

(গ) ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি।

৩। মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর প্রথম কোথায় স্থাপিত হয়-

(ক) কলকাতা (খ) মুজিবনগর

(গ) ঢাকা (ঘ) দিল্লি।

৪। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন-

(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) তাজউদ্দিন আহমেদ

(গ) এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান (ঘ) কর্নেল ওসমানী।

৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন-

(ক) কর্নেল (অব.) আব্দুর রব (খ) মেজর জিয়াউর রহমান

(গ) কর্নেল (অব.) ওসমানী (ঘ) কর্নেল (অব.) তাহের।

৬। বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত ছিলেন-

(ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (খ) তাজউদ্দিন আহমেদ

(গ) এ. কে. খন্দকার (ঘ) মেজর জলিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের নাম লিখুন।

২। মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর সরকারের কাঠামো কেমন ছিল?

২। মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে কে কোন দায়িত্ব পালন করেছিলেন?

পাঠ-১

অভ্যন্ত রীণ প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ সামরিক প্রশাসন সম্পর্কে জানবেন;*
- *মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ বেসামরিক প্রশাসন সম্পর্কে অবহিত হবেন;*
- *মুজিবনগর সরকারের কোন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কি দায়িত্ব পালন করেছিল তা জানবেন;*
- *মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্ঠা পরিষদ কারা ছিলেন সে সম্পর্কে জানবেন;*
- *বাংলাদেশের যুদ্ধাঞ্চলকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।*

মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।একটি জাতির মুক্তির সংগ্রামকে সুসংগঠিতভাবে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়ার মূল দায়িত্বটিই পালন করে মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন। মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:

ক. সামরিক প্রশাসন এবং

খ. বেসামরিক প্রশাসন

ক. সামরিক প্রশাসন

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সামরিক প্রশাসন। সামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। এ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উপসচিবের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে আব্দুস সামাদ এবং আকবর আলী খান। অভ্যন্তরীণ সামরিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সশস্ত্র বাহিনী দপ্তর পরিচালন। এ দপ্তরই ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান ও মূল অঙ্গ সংস্থা। সশস্ত্র বাহিনী দপ্তরের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন কর্ণেল ওসমানী। এ ছাড়া সেনাপ্রধান ছিলেন লে. কর্নেল আব্দুর রব, উপপ্রধান সেনাপতি ও বিমান বাহিনী প্রধান ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, মেডিকেল সার্ভিসেস-এর মহাপরিচালক ছিলেন কর্নেল সামছুল হক। প্রতিরক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১। বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে অধিনায়ক নিযুক্ত করা এবং যুদ্ধ পরিচালনা তদারকি করা।

২। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতা রেখে কাজ করা।

৩। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতা বজায় রেখে নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসা ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৪। সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের সাহসিকতাস্বরূপ পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি।

এছাড়া পরবর্তীতে তিনজন সেক্টর কমান্ডার-এর নেতৃত্বে এস.ফোর্স (কে. এম. সফিউল্লাহর নেতৃত্বে), জেড. ফোর্স (জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে) এবং কে. ফোর্স (খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে) নামক তিনটি বিগ্রেড গঠন ও তা পরিচালনা করাও ছিল সামরিক প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

খ. বেসামরিক প্রশাসন

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় ছিল বেসামরিক প্রশাসন। বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

১. অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট সমূহের অন্যতম হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে সরকার যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তা হচ্ছে-

- বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ,
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদের হিসাব প্রস্তুত,
- বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে অর্থ প্রদানের দায়িত্ব পালন ও বিধিমালা প্রণয়ন,
- আর্থিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন,
- রাজস্ব ও শুল্ক আদায়,
- আর্থিক অনিয়ম তদন্তের জন্য কমিটি গঠন।

উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকারের) পূর্ণাঙ্গ বাজেট ছিল। আয়-ব্যয়ের হিসেব সংবলিত এই বাজেটে শুধু সরকারের নয়, বিভিন্ন দফতর, অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, জোনাল অফিস, যুব ক্যাম্প, শরণার্থী, বেতার, প্রচারণা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা ছিল।

২. মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ঃ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং তাঁর অধীনে অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত হয় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়। এ সচিবালয়ের দায়িত্ব ছিল-

- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রিপরিষদের নিকট/সভায় পেশ করা,
- মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ,
- বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ,
- মন্ত্রিপরিষদের সাথে সম্পর্কিত নয় কিন্তু কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীনও নয় এমন অন্যান্য বিষয়াদি তদারকি এবং
- আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।

উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ সচিব রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের দায়িত্বও পালন করতেন।

৩. সাধারণ প্রশাসন বিভাগঃ সাধারণ প্রশাসন বিভাগে একজন পূর্ণ সচিব নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করতেন। এই বিভাগটি সরকারের সংস্থাপন বিষয়ক কাজ যথা- প্রবেশন, নিয়োগ, বদলি, পোস্টিং, শৃঙ্খলা রক্ষা, সরকারি নিয়োগের নীতিমালা বাস্তবায়ন, মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা সংরক্ষণ, নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরী, আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের অধীন সকল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে লোক নিয়োগ ইত্যাদি কাজ ছিল সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংস্থাপন মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং) নিজে সরকারের অধীন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল পদে নিয়োগ দান করতেন।

এছাড়া আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বিভাগের (ডিপার্টমেন্টের) কর্মকর্তাদের অফিসসমূহের ব্যবস্থা করা, অফিসসমূহের বাজেট অনুমোদন ইত্যাদি ছিল সাধারণ প্রশাসনের আওতাভুক্ত।

আঞ্চলিক প্রশাসনঃ আঞ্চলিক প্রশাসন সৃষ্টি মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। মূল পরিকল্পনার অধীনে ৫টি অঞ্চল (জোন) সৃষ্টি করা হলেও দেশব্যাপী সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জুলাই মাসে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে আঞ্চলিক প্রশাসকও নিয়োগ করা হয়। প্রশাসকগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। শরণার্থী সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সামরিক বেসামরিক বিষয়াবলির সুষ্ঠু সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণভার এই প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোর ওপর ন্যস্ত ছিল। আঞ্চলিক প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নির্বাচন চেয়ারম্যান তাঁদের অধীনস্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক সমন্বয়কারী হিসেবে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

মুজিবনগর সরকারের ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চল ও এর দায়িত্ব প্রাপ্তদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

প্রশাসনিক অঞ্চল	আঞ্চলিক চেয়ারম্যান	আঞ্চলিক প্রশাসক	আঞ্চলিক সদর দপ্তর
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	এস.এ. সামাদ	সাবরুম
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-২	জহুর আহমেদ চৌধুরী	কাজী রকিবউদ্দিন	আগরতলা
পূর্ব অঞ্চল	কর্নেল এম.এ.রব	ডা.কে.এ. হাসান	ধর্মনগর
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল -১	দেওয়ান ফরিদ গাজী	এস.এইচ. চৌধুরী	ডাউকি
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল -২	সামছুর রহমান খান	লুৎফর রহমান	তুরা
উত্তর অঞ্চল	মতিউর রহমান	ফয়েজউদ্দীন আহমেদ	কুচবিহার
পশ্চিম অঞ্চল-১	মোঃ আবদুর রহিম	এম.এ. কাশেম খান	বালুরঘাট
পশ্চিম অঞ্চল-২	আশরাফুল ইসলাম মিয়া	জহুরুল ইসলাম ভূঁইয়া	মালদহ
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-১	আবদুর রউফ চৌধুরী	শামসুল হক	কৃষ্ণনগর
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২	ফণীভূষণ মজুমদার	বি.বি. বিশ্বাস	বনগাঁও
দক্ষিণ অঞ্চল	আবদুর রব সেরনিয়াবত	এ. মমিন	বারাসাত

এছাড়াও ১৮টি জেলায় ১৮ জন জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল- যারা কালবিলম্ব না করে স্ব স্ব এলাকার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আঞ্চলিক প্রশাসক ছাড়াও প্রতিটি প্রশাসনিক অঞ্চলে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ কর্মরত ছিলেন-

- আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
- আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তা
- আঞ্চলিক ত্রাণ কর্মকর্তা
- আঞ্চলিক প্রকৌশল কর্মকর্তা
- আঞ্চলিক পুলিশ কর্মকর্তা
- আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তা
- আঞ্চলিক হিসাব কর্মকর্তা

উক্ত কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন।

আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্বসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

- মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত সেক্টর কমান্ডারদের সংগে কাজের সমন্বয় সাধন ও পূর্ণ সহযোগিতা করা,
- মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলো পরিচালনা এবং সতর্কতার সংগে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট ও ট্রেনিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করা,
- শরণার্থীদের দেখাশোনা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সংগে কাজের সমন্বয় সাধন করা,
- তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত হাজার হাজার পুস্তিকা, প্রচারপত্র পোস্টার শরণার্থী ক্যাম্পগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিতরণের ব্যবস্থা করা,
- পাকবাহিনী কর্তৃক দখলকৃত অঞ্চল থেকে কোন সরকারি কর্মচারি এসে হাজির হলে তার নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করে যোগ্যতা অনুসারে কাজে লাগানো ও বেতনের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশাসনিক কাঠামো কার্যকর ছিল। আঞ্চলিক (জোনাল) কাউন্সিল ও দপ্তরসমূহ থাকার ফলে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল- যে কারণে ১৬ ডিসেম্বরের আগেই কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব এলাকার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য কর্মকর্তারা স্ব স্ব পদে যোগদান করে কালবিলম্ব না করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৪. **স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ:** প্রাথমিকভাবে একজন মহাপরিচালকের অধীনে গঠন করা হয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ। পরে মহাপরিচালককে সরকারের সচিবের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এ বিভাগের কার্যাবলী দু'টি পৃথক ক্যাটেগরীতে ভাগ করা হয়েছিল, যথা-

- সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং
- বেসামরিক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও কল্যাণ।

সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা: সামরিক বিভাগের চিকিৎসা সেবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়-

- সার্জন ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা,

- আহত/মৃত ব্যক্তিদের বহনের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা,
- ঔষধপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ,
- শল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ,
- মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা দল গঠন,
- যুদ্ধাহতদের আরোগ্যের পর বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা,
- যুদ্ধে শহীদদের ওপর নির্ভরশীলদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা,
- সম্পূর্ণরূপে অক্ষমদের জন্য পেনশন/ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং,
- আংশিক অক্ষমদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত কাজের জন্য প্রায় দশ লক্ষ রুপি অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থাও করা হয়।

বেসামরিক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও কল্যাণ: বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের নাগরিকদিগকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এই কাজের জন্য ৯,৫০,০০০.০০০ রুপি নির্দিষ্ট করা হয়।

স্বাস্থ্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ:

উদ্বাস্তু শিবিরের তত্ত্বাবধানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশী চিকিৎসকদের বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বন্ধুসুলভ সংস্থা থেকে অনুদান হিসাবে ঔষধ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং রিকুইজিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন সেক্টরে সেগুলি পাঠানোর দায়িত্বও ছিল স্বাস্থ্য বিভাগের। বিভিন্ন সেক্টরের জন্য সরঞ্জামাদি, এম্বুলেন্স ইত্যাদি বন্ধুদেশগুলো থেকে পাওয়া না গেলে সংগ্রহের দায়িত্বও স্বাস্থ্য বিভাগের ওপর অর্পন করা হয়।

৫. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়: মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ইউনিট ছিল তথ্য ও প্রচার বিভাগ। স্বাধীন বাংলা বেতার সরকারের অধীন সর্বপ্রথম সংস্থাসমূহের অন্যতম। প্রাথমিক অবস্থায় টাঙ্গাইলের আওয়ামী দলীয় এম.এন.এ. আবদুল মান্নানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রেডিও স্থাপন করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতারে ১০০-এর অধিক লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। বেতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম বিধায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেবল যুদ্ধ পরিচালনার পরেই এর স্থান। সরকার সব সময় এর জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের খবর এবং পাকবাহিনীর হত্যা ও অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করার পাশাপাশি পাকবাহিনীকে ধিক্কার ও বিদ্রুপ করে এম. আর. আখতার মুকুল রচিত ও পঠিত চরমপত্র প্রচার করত যা অবরুদ্ধ দেশবাসী ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করত।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে যে বাড়িতে কলকাতায় আসার পর তাজউদ্দিন আহমদ প্রথম উঠেছিলেন তারই একটি কক্ষে চাদর-কাপড় ঝুলিয়ে সাউন্ডপ্রুফ রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। রেকর্ডিং-এর জন্য সম্বল ছিল দু'টো ভাঙ্গা টেপ রেকর্ডার। ভারত সরকারের কাছ থেকে পঞ্চাশ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। সকল দিকে প্রচার জোরদার করার উদ্দেশে মিত্র সরকারসমূহের অধীনস্ড় তথ্য সংস্থা প্রধানদের সাথে পর্যায়ক্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হতো।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১ম দিনের অনুষ্ঠান: ২৫ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল কোরান

তেলাওয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ অনুষ্ঠান অগ্নিশিখা, সাহিত্যের অনুষ্ঠান রক্তস্বাক্ষর, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ভিত্তিক অনুষ্ঠান বজ্রকণ্ঠ, বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ এবং চরমপত্র। কামাল লোহানী সংবাদ সংগঠনের দায়িত্ব নেন। কোরান তেলাওয়াত করেন জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী। হাসান ইমাম সালেহ আহমদ ছদ্মনাম নিয়ে বাংলা খবর পড়েন। ইংরেজি খবর পড়েন পারভিন হোসেন। মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা টি. হোসেনের স্ত্রী মিসেস টি. হোসেন পারভিন ছদ্মনাম নিয়ে ইংরেজি খবর পড়েন। বাংলা সংবাদের ইংরেজি অনুবাদের পান্ডুলিপি তৈরী করেন এম. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন পূর্ণ সচিব নিযুক্ত ছিলেন। তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার নিকট সেগুলো প্রেরণ করা ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রধান কাজ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৪টি রেঞ্জের জন্য ৪ জন ডিআইজি এবং প্রতি জেলার জন্য একজন এসপি নিয়োগ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলসমূহের দায়িত্ব পালন করতেন। এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কাজগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- অবমুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন,
- ভ্রমণ ডকুমেন্ট ইস্যু করা,
- তদন্ত পরিচালনা ইত্যাদি।

৭. ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ: রিলিফ কমিশনের অধীনে সংগঠিত একটি বিভাগ- যা সরাসরি স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করত। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ:

- ত্রাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকার আবেদনপত্র নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিকদিগকে সাহায্য করা,
- জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের কাঠামোর মধ্যে জোনাল রিলিফ অফিসসমূহের ব্যবস্থা করা,
- বাংলাদেশ শিক্ষক মন্ডলীর রিলিফের ব্যবস্থা,
- উদ্বাস্তু শিবিরের শিশুদের উপকারার্থে শিক্ষকদের সেবা কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সহযোগিতায় ক্যাম্প-স্কুলসমূহের জন্য একটি স্কিম প্রণয়ন ও আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

৮. সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়: পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে এটি দেখাশুনা করতেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি সমস্যাদি সমাধানের দায়িত্ব পালন করত এই বিভাগ।

৯. কৃষি বিভাগ: এ বিভাগটি পুরোপুরি সংগঠিত ছিল না। কেবল একজন সচিব নিয়োগ করা হয়েছিল- যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের নক্সা ও পরিকল্পনা তৈরী করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১০. প্রকৌশল বিভাগ: এ বিভাগে একজন প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে জোনাল ইঞ্জিনিয়ারগণ সেক্টর কমান্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। মুক্ত এলাকার প্রকৌশল বিষয়ক সমস্যাদি সমাধানেও তারা দায়িত্ব পালন করতেন।

১১. উপদেষ্টা পরিষদ গঠন: মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সমর্থনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা। এজন্য ন্যাপের মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ও কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধরের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থা ছিল যারা সরাসরি মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীন কাজ করতেন, যেমন-

ক. পরিকল্পনা কমিশনঃ ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে এবং ড. খান সরওয়ার মুর্শেদ, ড. মোশাররফ হোসেন, ড. এস.আর. বোস ও ড. আনিসুজ্জামানকে সদস্য করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়।

কমিশনের দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত উদ্দেশ্যাবলির ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন,
- দেশ ও অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন,
- দেশের তাৎক্ষণিক পুনর্গঠনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান-

- বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের সমস্যা,
- উচ্ছেদকৃত লোকদের বাসস্থান সমস্যা,
- খাদ্য সমস্যা,
- যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন,
- সাধারণ সুবিধাদি, যেমন-স্বাস্থ্য, বিদ্যুত, পানি, হাসপাতাল ইত্যাদির পুনর্বাসন,
- ক্ষতিগ্রস্ত সকল বন্দর, কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পুনরায় চালু করা,
- আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা,
- শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাদি পুনঃস্থাপন,
- যতটুকু সম্ভব মুক্তিবাহিনীতে যোগদানকারী যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা,
- সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আরম্ভ করা,
- ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুনর্বাসন,
- দেশের ভবিষ্যত বাণিজ্য ইত্যাদি।

পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করত।

খ. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড: স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি বাণিজ্য বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ড শুধুমাত্র আয়ের উৎস হিসাবেই নয় বরং বাংলাদেশের আর্থিকভাবে টিকে থাকার জন্য বিদেশে পণ্য রপ্তানীর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান করত। ভারতের সাথে বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্য বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য বোর্ড যুক্তভাবে ভারত সরকার এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ট্রেডিং কর্পোরশনের সাথে আলোচনা করত। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানী পণ্য পরিবহন সুবিধাদির ব্যবস্থা সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়াদি সম্পর্কেও তারা আলোচনা করেন। এসব আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল।

গ. যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড: এ বোর্ডের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম.এন.এ.। যুবশিবিরগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর অর্পন করা হয়েছিল- যিনি বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ইয়ুথ ও রিসেপশন ক্যাম্প-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় ২৪টি যুব শিবির ও ১১২টি অভ্যর্থনা শিবির ছিল। বোর্ড অনুমোদিত বাজেটের ভিত্তিতে যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরসমূহের চাহিদা মিটাতো। ব্যাপক আকারে যুব ক্যাম্প ইউনিটগুলোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। নিয়মিতভাবে যুব ক্যাম্প থেকে ছেলেদেরকে এনে গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। যুবকদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- বিছানাপত্র, গরম পোষাক, কম্বল ইত্যাদির ব্যবস্থা বন্ধু সংস্থাসমূহ এবং মুজিবনগর সরকারের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা থেকে করা হয়েছিল।

ঘ. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি: এ কমিটির প্রধান ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কমিটি বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের দেখা-শুনার দায়িত্ব পালন করত।

ঙ. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড: একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে শরণার্থীদের কল্যাণে শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড কার্যকর ছিল।

এছাড়াও সরকারি কর্মকান্ডে সহায়ক হিসেবে নিম্নে তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছিল-

ক. বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি (ড. আসহাবুল হক এম.পি.এ.)

খ. বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান এম.এন.এ.)

গ. বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা (আমিনুল ইসলাম এম.এন.এ.)।

সারসংক্ষেপ

মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্বটি পালন করে মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল সামরিক ও বেসামরিক- এ দু'ভাগে বিভক্ত। সামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে- যার দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্বয়ং। বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে অধিনায়ক নিযুক্ত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা তদারকি করা ছিল এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। বেসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাধারণ প্রশাসন এবং তথ্য ও বেতার বিভাগ। সাধারণ প্রশাসন বিভাগটি নিয়োগ, বদলি, পোস্টিং, শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব অর্থাৎ সরকারের সংস্থাপন বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করত। আঞ্চলিক প্রশাসনও ছিল বেসরকারি প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন একজন চেয়ারম্যান ও একজন প্রশাসক। শরণার্থী সমস্যা, আঞ্চলিক সামরিক-বেসামরিক বিষয়াবলীর সুষ্ঠু সমন্বয় ইত্যাদি ছিল আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান কাজ। এছাড়া অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এ বেতার কেন্দ্রে প্রায় ১০০ লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধের খবর, পাকবাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ ও

নির্যাতনের খবর এবং পাকবাহিনীকে ধিক্কার দিয়ে ও বিদ্রুপ করে রচিত চরমপত্র এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করা হতো। এ বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭,।

২। এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি অবস্থান*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৫।

৩। মঈদুল হাসান, মুলধারা '৭১।

৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ৩য় ও ৮ম খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (|) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধাঞ্চলকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
(ক) ৫টি (খ) ৭টি
(গ) ১১টি (গ) ১০টি।

২। আঞ্চলিক প্রশাসনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন-
(ক) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে (খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক
(গ) আঞ্চলিক প্রশাসন কর্তৃক (ঘ) প্রধান সেনাপতি কর্তৃক।

৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কতজন লোক নিয়োগ করা হয়েছিল?
(ক) ১০০ জন (খ) ২০০ জন
(গ ৩০০ জন (ঘ) ৪০০ জন।

৪। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন-
(ক) ড. আনিসুজ্জামান (খ) ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী
(গ) ড. খান সরওয়ার মুর্শেদ (ঘ) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

৫। মুজিবনগর সরকারের কয়টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র ছিল?
(ক) ১১০টি (খ) ১১১টি
(গ) ১১২টি (ঘ) ১১৩টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। মুজিবনগর সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
২। মুজিবনগর সরকারের আঞ্চলিক প্রশাসনের সদর দপ্তরসমূহের নাম লিখুন।
৩। আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্বসমূহ আলোচনা করুন।
৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণ দিন।
৫। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। মুজিবনগর সরকারের বেসামরিক প্রশাসনের বিবরণ দিন।
২। মুজিবনগর সরকারের আঞ্চলিক প্রশাসনের বিবরণ দিন।
৩। পরিকল্পনা কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-১

বহির্বিশ্বে তৎপরতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- *বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের মিশন স্থাপন সম্পর্কে জানবেন;*
- *বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হবেন;*
- *বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিদেশে তহবিল সংগ্রহ সম্পর্কে জানবেন;*
- *বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলাফল জানতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। কারণ বহির্বিশ্বে তৎপরতার মধ্যদিয়ে মুজিবনগর সরকার বাঙালির প্রতি পাক শাসকদের অন্যায়-অবিচার, শোষণ নিপীড়ন, হত্যা ও ধ্বংস এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক. বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের মিশন স্থাপন

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোম সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং ঐসব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

১. ভারতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন: মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দু'টি মিশন স্থাপন করে। নয়াদিল্লিতে মিশন প্রধান ছিলেন হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী এবং কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন জনাব হোসেন আলী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের সহকারী কমিশনার জনাব হোসেন আলী ১০ জন সহকর্মী সহ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তান মিশন ভবন হতে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। বিদেশে কলকাতাতেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়।

২. ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন: মুজিবনগর সরকার চট্টগ্রামের এম.এন.এ. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকীকে উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। ৫ আগস্ট ওয়াশিংটন পৌঁছে আগস্টের

শেষ দিকে তিনি ১২২৩, কানেটিকাট এভেন্যুতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করেন। আমেরিকার বাঙালি ও অন্যান্য বন্ধু সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা, সংবাদ সম্মেলন, টিভি প্রোগ্রাম ও র‍্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ, প্রচার ও জনমত গঠন এবং বিশেষ করে কংগ্রেসে উত্থাপিত প্রস্তাব বা সংশোধনীর ওপর তদ্বির করা ছিল এ মিশনের প্রধান কাজ। উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুর রহমান ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত। ১৯৭১ সালের ৩ আগস্ট মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে বৈদেশিক সাহায্য আইনের সংশোধনী পাশ হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী পাকিস্তানে সবধরনের মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সংশোধনী পাশে ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ ইনফর্মেশন সেন্টার (ওয়াশিংটন প্রবাসী বাঙালি ও তাদের সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত) ও বাংলাদেশ মিশন অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

৩. নিউইয়র্ক ও জাতিসংঘে মিশন স্থাপন: নিউইয়র্কে নিয়োজিত পাকিস্তানি ভাইস কন্সাল এ.এইচ. মাহমুদ আলী ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর বেশ কিছুদিন পর মুজিবনগর সরকার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরিকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও নিউইয়র্ক দূতাবাসের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করে। মাহমুদ আলী বিচারপতি চৌধুরীর প্রতিনিধি দলের সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত হন।

৪. লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন: ২৭ আগস্ট বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনস্থ বেজওয়াটার এলাকায় নটিংহিল গেটের নিকট ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেন্সে প্রায় ৩০০ বাঙালি এবং বহু বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ মিশন উদ্বোধন করেন। তবে মিশন স্থাপন করা হয়েছিল আরও আগে। ভারতের বাইরে লন্ডনেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। বিচারপতি চৌধুরী এ মিশনেরও প্রধান নিযুক্ত হন। এ মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কূটনৈতিক কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে পূর্ব লন্ডনের ১১ নম্বর গোরিং স্ট্রীটে ৩ মে একটি অফিস নেয়া হয় যেখান থেকে বেসরকারি কর্মীরা সাংগঠনিক ও প্রচার কার্য চালানোর দায়িত্ব পালন করতেন। ১১ আগস্টে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হবে বলে ১০ আগস্ট ইয়াহিয়া খানের মুখপাত্র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান। এ অবস্থায় শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনের বিখ্যাত সলিসিটরদের প্রতিষ্ঠান বার্নার্ড শেরিডান এ্যান্ড কোম্পানীকে নিয়োগ করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী সন ম্যাকব্রাইডকে ইসলামাবাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কোন বিদেশী আইনজীবিকে শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ অথবা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে দেয়া হবে না বলে ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়।

৩০ অক্টোবর লন্ডনের হেনরী থর্নটন স্কুলে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং বিকাল বেলার আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে ছাত্ররা ঘোষণা করে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন সমাধান তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। নভেম্বর মাসের শেষদিকে বিচারপতি চৌধুরী লন্ডন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাখ্যা করার জন্য হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক সিটি, কলম্বিয়া, হোফস্ট্রা ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) ও হার্ভার্ড স্কুল অব ল সফর করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

৫. সুইডেনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নিয়োগ: বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আব্দুর রাজ্জাককে সুইডেনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নিয়োগ করে তা অনুমোদনের জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকারকে পত্রযোগে অনুরোধ করেন এবং এটা কার্যকর হয়।

খ. বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত নিয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বহির্বিশ্বে সমর্থন ও জনমত আদায়ের চেষ্টা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কতিপয় শক্তিশালী দেশের সমর্থন লাভে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো। এ ধরনের তৎপরতার ফলে ঐসব দেশে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল সংবাদ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় আসেন। এরপর হতে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরে আসেন নি। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর মূল দায়িত্বই ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বহির্বিশ্বে তৎপরতা চালানো। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বিচারপতি চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর শারীরিক সুস্থতা ও প্রাণহানির আশংকায় বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বিচারপতি চৌধুরীর তৎপরতায় ১৪ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব পাশ হয় যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে প্রভাব রয়েছে তা প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে বাধ্য করা ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য।

পাকিস্তানের অত্যাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশে ১ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাবেশে বৃটেনের বিভিন্ন এলাকা হতে ২০ হাজারেরও বেশি বাঙালি যোগ দেন। এ সভায় বক্তৃতাকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের তিনটি নির্দেশের কথা ঘোষণা করেন, যথা-

১. শীঘ্রই লন্ডনে একটি হাইকমিশন স্থাপন করা হবে বলে মুজিবনগর সরকার জানিয়েছেন।

২. পাকিস্তানের বিমানে ভ্রমণ না করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে মুজিবনগর সরকার অনুরোধ করেছেন।

৩. পাকিস্তান অথবা বিদেশে কর্মরত বাঙালি সরকারি কর্মচারিদেরকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানিয়েছেন।

মুজিবনগর সরকারের তিনটি নির্দেশ ঘোষণা করার পরপরই অপ্রত্যাশিতভাবে লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে নিয়োজিত দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের চাকরি হতে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর একে একে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত বাঙালি কূটনীতিকগণ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আনুগত্য পরিবর্তন করতে থাকেন। ১ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারে প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি দূতাবাসের ইকনমিক কাউন্সিলর এ.এম.এ. মুহিত। ৪ আগস্ট ওয়াশিংটনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস ও নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরে পাকিস্তানি মিশনের

মোট ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের ডিরেক্টর অব অডিট ও একাউন্টস জনাব লুৎফুল মতিন। বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রতিবাদে ১১ আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় পাকিস্তান হাইকমিশনের কয়েকজন অফিসার বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ম্যানিলায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী এবং নাইজেরিয়ায় নিয়োজিত কূটনীতিক মহীউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার ১৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন। ৪ অক্টোবর নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী প্রকাশ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দিল্লিতে 'চিফ অফ মিশন' পদে নিয়োগ করেন। ৮ অক্টোবর লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের 'পলিটিক্যাল কাউন্সিলর' রেজাউল করিম বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন। আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানি দূতাবাসে নিয়োজিত বাঙালি রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোমিন ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ৩ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের পাকিস্তানি দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি ওয়ালিউর রহমান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন।

১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নরওয়ের রাজধানী অসলো পৌঁছান। অসলো শহরে ৬ দিন অবস্থানকালে তিনি নরওয়ের প্রধান বিচারপতি, অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন, অসলোর মেয়র এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং স্থানীয় টিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ, বিদ্যমান পরিস্থিতি ও সংগ্রামের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। এছাড়া বাংলাদেশে গণহত্যা সংগঠনের অপরাধে পাকিস্তানের বিচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনে উদ্যোগী হন। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন প্রস্তাবিত ট্রাইবুনালের সদস্য পদ গ্রহণ করতে রাজী হন। কিন্তু ট্রাইবুনাল গঠনের পূর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী সুইডেন গমন করেন। সুইডেন পৌঁছে তিনি সেখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, লিবারেল পার্লামেন্টারী পার্টির চিফ হুইপ প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান ও সাংবাদিক সম্মেলন করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিচারপতি চৌধুরীর অনুরোধে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুনার মীরডাল স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌঁছেন এবং পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য, পার্লামেন্টের স্পীকার এবং বৈদেশিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন। জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনে যোগদানের জন্য মনোনীত ডেনিশ প্রতিনিধি দলের নেতাদের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। জাতিসংঘের অধিবেশনকালে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে ডেনিশ প্রতিনিধিদলের নেতা সহায়তা করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে আশ্বাস দেন।

গ. বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের চেষ্টা

মে মাসের প্রথম দিকে শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান সরকারের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে যান। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিনিধি। দ্বিতীয় দফায় তিনি সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক সভায় তদ্বির, বাংলাদেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলে যোগদান, বাঙালি ও মার্কিন শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ, মার্কিন কংগ্রেসে তদ্বির করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন। এইড কন্সসির্য়াম- এর সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করার যুক্তি উপস্থাপন করেন। এসব তৎপরতার ফলে জুন মাসে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে দাতাগোষ্ঠী পাকিস্তানকে নতুন সাহায্যদানে বিরত থাকে এবং ঋণ রেয়াতি দিতেও আপত্তি জানায়। ২ অক্টোবর ওয়াশিংটনে দাতাগোষ্ঠীর সভা বসে। এবারও পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান স্থগিত করা হয়।

জাতিসংঘে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল ও মার্কিন জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানানো এবং বাঙালি গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মুজিবনগর সরকার ২৪ মে বিচারপতি চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে। জনাব চৌধুরী ছিলেন মুজিবনগর সরকারের দ্বিতীয় প্রতিনিধি- যিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি নরওয়ে, সুইডেন, মিশর, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া, সৌদি আরব, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘে অবস্থিত আর্ন্তজাতিক প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট ড. যোগেন্দ্র কুমার ব্যানার্জীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসব কর্মকান্ডের ফলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ পরিষ্কার ধারণা লাভ করে।

১৯৭১ সালের ১৯ আগস্ট কানাডার টরেন্টোতে বাংলাদেশ সংকট নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৃটেন, কানাডা, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের জনপ্রতিনিধি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি সাংসদ মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী ও এ.এম. আব্দুল মুহিতের প্রচেষ্টায় টরেন্টো ডিক্লারেশন অব কনসার্ন নামে যে ঘোষণা দেয়া হয় সেখানে পাকিস্তানে সব ধরনের সাহায্য বন্ধ রাখা এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবি করে শেখ মুজিবের মুক্তি ও জীবনের নিশ্চয়তা চাওয়া হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের অক্টোবরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এ দলে ছিলেন রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ। ১৬ অক্টোবর হতে ২০ অক্টোবর তারা ওয়াশিংটনে সিনেটর কেনেডি, পার্সী ও কংগ্রেসম্যান গালাকার সহ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৪৭টি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তবে এসব বক্তব্যে গণহত্যা বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তেমন কোন মুখ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি বরং রাজনৈতিক সমাধানের আবেদনই ছিল মুখ্য। তবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত সহৃদয়তার সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরী ও তার সহকর্মীদের বক্তব্য শোনেন এবং তাঁদের সরকারকে তা জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

২৬ জুলাই হাউস অব কমন্সের হারকোর্ট রুমে স্বাধীন বাংলাদেশের ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সদ্য প্রকাশিত ডাক টিকিটসমূহ প্রদর্শন করেন। দশ পয়সার টিকিটে বাংলাদেশের মানচিত্র এবং পাঁচ পয়সার টিকিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হয়। বিদেশে চিঠিপত্র পাঠাতে ভারত সরকার এই

ডাক টিকিটসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা পায়।

বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১ অক্টোবর জাতিসংঘ ভবনের বিপরীত দিকে অবস্থিত চার্চ সেন্টারের একটি বড় হলঘরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। এসময় বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি তিনটি পূর্বশর্ত উল্লেখ করেন। যথা-

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান।

২. অবিলম্বে এবং বিনাশর্তে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দান।

৩. ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অবিলম্বে অপসারণ।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনটি সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে নভেম্বর মাসে নিউইয়র্ক হতে ওয়াশিংটন সফরে যান এবং সেখানে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও সিনেটর স্যাক্সবী সহ কয়েকজন সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যান গালাকারের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত এম.আর. সিদ্দিকী প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সম্মানার্থে একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তবে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে দু'একটি ছাড়া অন্য সব দূতাবাসের প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর জয়যাত্রা যখন অব্যাহত তখনই নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও অপর সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাউন্সিল সদস্যদেরকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন না দিতে অনুরোধ করেন। পরিষদে আলোচনা শুরু হলে মুজিবনগর সরকারের বক্তব্য পেশ করার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পরিষদের সভাপতির নিকট একটি আবেদন পত্র পেশ করেন। কিন্তু জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বে কোন একটি সরকারের প্রতিনিধিকে কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করতে দেয়া উচিত হবে না- এই বলে চীন পর পর দুর্বার ভেটো প্রয়োগ করে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিদেশে তহবিল সংগ্রহ

মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিদেশে তহবিল সংগ্রহ করা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা। ১৯৭১ সালের ৮ মে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের জরুরি মিটিং-এ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন এ ফান্ডের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য। এই ফান্ড ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সংগ্রহ করে যা সরাসরি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশ হতে সরাসরি যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

বাহরাইনের বাংলাদেশ ক্লাব হতে = ১৪৯৭.৫৭ পাউন্ড

কাতারের বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র হতে = ৩১০০.২৯ পাউন্ড

লিবিয়ার বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র হতে = ২৩৮২.৪২ পাউন্ড

সরাসরি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্থসংগ্রহ ছাড়াও শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারত সরকার বিভিন্ন দেশ হতে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেছিল। জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

যুক্তরাষ্ট্র = ৮,৯১,৫৭,০০০ ডলার

যুক্তরাজ্য = ৩,৮১,১২,১৩২ ডলার

কানাডা = ২,০২,৬০,৩০৭ ডলার

সোভিয়েত ইউনিয়ন = ২,০০,০০,০০০ ডলার

সুতরাং দেখা যায় যে, বিভিন্ন মাধ্যমে বহির্বিশ্ব হতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগৃহিত হয়েছিল।

এভাবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পাকবাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী পূর্বাঞ্চলে নিয়োজিত ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর যৌথ কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট বিকাল ৪.৩১ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে এক জনসভায় বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাঙালি ও সমর্থন দানকারি ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যুদ্ধকালীন নয়মাস আতিথিয়তা প্রদর্শনের জন্যও ব্রিটেনকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঙ. বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলাফল

বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলাফল ছিল খুবই সুদুরপ্রসারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন- তা বহির্বিশ্বে প্রচার করা এবং এর প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি ও সম্ভব হলে স্বীকৃতি আদায় করা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার প্রধান লক্ষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালিদের প্রতি যে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্নমুখী তৎপরতার ফল। বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ব্রিটেনে কূটনৈতিক তৎপরতা ও সেখানে প্রবাসী বাঙালিদেরকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন ও জনমত গঠনে বিশেষ সফলতা এসেছিল। শুধু তাই নয় বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলে বিদেশে প্রশিক্ষণরত সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ০৭ (সাত) জন এবং যুক্তরাজ্যে ০২ (দুই) জন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিলেন। তাছাড়া ইরাক, ফিলিপাইন ও আর্জেন্টিনার পাক রাষ্ট্রদূতগণ এবং কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, কাঠমন্ডু ও হংকং প্রভৃতি স্থানে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কূটনৈতিকগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকারের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। ফলে অতি স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকবাহিনীর

গণহত্যা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয় বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা শরণার্থী সমস্যা নয় বরং এটা ছিল শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম। চীনের বাধার কারণে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বক্তৃতা করতে না পারলেও এই প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে বিশ্ববাসি বাঙালির স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমেরিকা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও আমেরিকার জনগণ ও প্রচার মাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি জনমতের চাপে আমেরিকা, বিশ্বব্যাংক ও ব্রিটেন পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও ইন্দোনেশিয়া সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন করেনি। এমনকি ৪ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক শাসনের বিধিনিষেধ ভংগ করে অসংখ্য ছাত্র বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল এবং ইন্দোনেশিয়ান টেলিভিশন আগস্টে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি খন্দকার মোশতাকের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে জনমত গড়ে উঠেছিল সে জনমতের চাপে পাক শাসকবর্গ শেখ মুজিবের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘ মহাসচিব শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন। সর্বোপরি বাংলাদেশ ও বাঙালির সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন ও আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতারই ফল।

সারসংক্ষেপ

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। কারণ এ ধরনের তৎপরতার ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকবাহিনীর ধর্ষণ, নির্যাতন ও গণহত্যা সর্ম্পকে জানতে পেরেছিল। মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির প্রতি বিশ্বব্যাপী যে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতারই ফল। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন, কূটনৈতিক তৎপরতা, প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের চেষ্টা, বিদেশে তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি ছিল বহির্বিশ্বে তৎপরতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এসব তৎপরতার ক্ষেত্রে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্ক ও লন্ডন দূতাবাসের প্রধান। তাছাড়া বহির্বিশ্বে তিনিই ছিলেন মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত। বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা শরণার্থী সমস্যা নয়, বরং এটা ছিল শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম। চীনের বাধার কারণে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বক্তৃতা করতে না পারলেও এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসি বাঙালির স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছিল। এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে জনমত গড়ে উঠেছিল সে জনমতের চাপে পাক শাসকবর্গ শেখ মুজিবের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সর্বোপরি বাংলাদেশ ও বাঙালির সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন ও আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতারই ফল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২। আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি।*

৩। তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ।*

৪। মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১।*

৫। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: দলিলপত্র*, ৪র্থ ও ত্রয়োদশ খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম মিশন কোথায় স্থাপিত হয়?

(ক) কলকাতা (খ) লন্ডন

(গ) দিল্লি (ঘ) ওয়াশিংটন।

২। কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কে ছিলেন?

(ক) হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী (খ) হোসেন আলী

(গ) এ.এস.এম. কিবরিয়া (ঘ) রেজাউল করিম।

৩। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিশেষ দূত ছিলেন-

(ক) এ.এম.এ. মুহিত (খ) হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী

(গ) অধ্যাপক রেহমান সোবহান (ঘ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

৪। মুক্তি যুদ্ধচলাকালীন বাংলাদেশ সরকার লন্ডনে কয়টি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল?

(ক) ৫টি (খ) ৪টি

(গ) ৮টি (ঘ) ৭টি।

৫। কোন পাকিস্তানি কূটনীতিক সর্বপ্রথম পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন?

(ক) কলকাতায় নিযুক্ত হোসেন আলী (খ) ওয়াশিংটনে নিযুক্ত এ.এম.এ. মুহিত

(গ) লন্ডনে নিযুক্ত মহিউদ্দিন আহমদ (ঘ) নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। মুক্তি যুদ্ধচলাকালীন বাংলাদেশ সরকার বহির্বিশ্বে কোন কোন স্থানে মিশন স্থাপন করেছিল?

২। মুক্তি যুদ্ধচলাকালীন বিদেশ হতে বিভিন্ন মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার ফলাফল আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। মুক্তি যুদ্ধচলাকালীন মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার বিবরণ দিন।

৩। মুক্তি যুদ্ধচলাকালীন মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন তা আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১। (খ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ); ৬. (ক)।

পাঠ-২: ১। (গ); ২। (ক); ৩। (ক); ৪। (খ); ৫। (গ)।

পাঠ-৩ : ১। (ক); ২। (খ); ৩। (ঘ); ৪। (গ); ৫। (ক)।

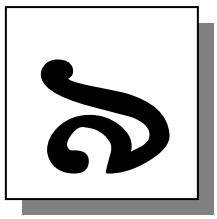

মুক্তিযুদ্ধ ও বহির্বিশ্ব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বিশেষ করে দুই পরাশক্তি- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রাইজিং পাওয়ার (Rising power) হিসেবে বিবেচিত ভারত ও চীনের ভূমিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। উল্লেখিত শক্তিসমূহের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিবেচনায় বিপক্ষ শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট ও সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ এবং চীনা জনগনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। যাহোক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই পরাশক্তি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান ছিল স্নায়ুযুদ্ধ। আদর্শিক দ্বন্দ্বে বিশ্বের বৃহৎ দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল এবং বিশ্ব রাজনীতিতে অন্যতম শক্তি হিসেবে (অনেকের মতে তৃতীয় শক্তি) আবির্ভূত হয়েছিল চীন। তাছাড়া ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এ দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম অবনতি ঘটেছিল। তদুপরি চীন-ভারত সীমান্ত উত্তেজনাতো ছিলই। আর